দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলাকালে ১৯৪১ সালের ৭ ডিসেম্বর জাপান হঠাৎ বিমান হামলা করে পার্ল হারবারে। চারটি যুদ্ধজাহাজ ডুবিয়ে দেয় এবং আরও চারটি ক্ষতিগ্রস্ত করে। তিনটি ক্রুজার, তিনটি ডেস্ট্রয়ারসহ আরও কিছু যুদ্ধজাহাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ১৪৪টি যুদ্ধ-উড়োজাহাজ ধ্বংস এবং আরও ১৫৯টি ক্ষতিগ্রস্ত করে। ২৪০৩ জন সৈন্য নিহত হয় এবং ১১৭৪ জন আহত হয়। সংক্ষেপে এই হলো তথ্য, বিশাল কিছু নয়; কিন্তু এরপরেও বিশাল, কারণ ওটা আমেরিকার ক্ষয়ক্ষতির খতিয়ান। আমেরিকা অন্যদেশ আক্রমণ করে, অন্যের ক্ষতি করেই অভ্যস্ত, আক্রান্ত হওয়া তাদের অভিধান বহির্ভূত বিষয়। জাপানি এই আক্রমণের পরে যুক্তরাষ্ট্র অফিসিয়ালি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। এর পরের ইতিহাস সবার জানা। আমেরিকায় জাপানি বংশোদ্ভূত জনগণের ওপর তীব্র নিপীড়ন নেমে আসে। তারপরে আসে পারমাণবিক বোমা, হিরোশিমা নাগাসাকি শহর ধ্বংস করে দেওয়া হয়, সাধারণ মানুষের লাশের ওপর দাঁড়িয়ে শান্তির প্রতিশ্রুতি দিয়ে আসে নতুন যুগ। বিশ্ব দুই শিবিরে বিভক্ত হয়ে যায়, একদিকে সাম্রাজ্যবাদী লুণ্ঠন, অন্যদিকে সমাজবাদী প্রতারণা। সে কাহিনি ইতিহাসবিদ ও রাজনীতিকদের জন্য।

ফেব্রুয়ারির ২০ তারিখে আমরা গিয়েছিলাম হনুলুলুর পলিনেশিয়ান কালচারাল সেন্টারে। বাস চলেছিল প্রশান্ত মহাসাগরের তীর ধরে। ডানদিকে ছিল জল, ঢেউ, দ্বীপ আর জলের মধ্য থেকে উঠে আসা এক নিঃশঙ্গ শৈল-পাহাড়। দেখতে সে মহিলাদের হ্যাট বা টুপির মতো।

যেন কোনো নারী জলে নেমে নিমজ্জিত করেছে দেহ, টুপিটি না খুলেই।

কী ছিল তার গায়ে? লিবিডোর বৃশ্চিক দংশিত কামনার জ্বর? কে দেবে তার উত্তর?

কয় লক্ষ বছর সে নেমে আছে জলে এবং কয় লক্ষ বছর পরে হবে তার প্রেমিকের প্রত্যাবর্তন, কেউ জানে না। না-আমি, না-তুমি। আমাদের লক্ষ বছর সময় নেই, পাথরের আছে।

বামপাশে পর্বতমালা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে নিশ্চুপ, মুখে তাদের নৈঃশব্দ্যের অর্গল। চিল উড়ছে সেই পর্বতরাজির মাথার ঠিক তালুর ওপরে, চক্রাকারে, যেমন লের্মন্তভের জাদুবদ্ধ 'ডেমন' উড়ছিল রূপসী তামারার বাড়ির ওপর। দিন দাঁড়িয়ে আছে থম করে।

আমি হাত ধরে বসে আছি যার, সে আমার আপন। নারিকেল গাছের পাতাগুলো নড়েনড়ে বাতাস দিচ্ছে, আকাশে নীলের মাঝে সাদা মেঘের বায়োস্কোপ। দৃশ্যের পরে দৃশ্য।

পলিনেশিয়ান সেন্টার হলো এক চমৎকার আনন্দ মেলা। সেখানে ছোট ছোট খাল কেটে তৈরি করা হয়েছে ছয়টি দ্বীপপুঞ্জ। এদের নিজস্ব ঘরবাড়ি, মন্দির, গুল্ম, বৃক্ষ ও ফুল-ফল। সারা বিশ্ব থেকে পড়তে আসা হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা এর প্রাণস্পন্দন। পড়াশোনার ফাঁকে ফাঁকে তারা এখানে কাজ করে। বিভিন্ন প্যাভিলিয়নের সঙ্গে পরিচিত করাসহ জাতিসমূহের ইতিহাস, সংস্কৃতি, গান-বাজনা-নাচ সবকিছুর পরিবেশক তারাই।

হেঁটে হেঁটে দেখা যায়, আবার এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাওয়া যায় নৌকায় চড়ে। আছে পাহাড়ি ঝরনা, আছে জলপ্রপাত, সবটাই মনুষ্য নির্মিত। প্রত্যেক প্যাভিলিয়নে আছে তাদের নিজস্ব সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত করার ২০-২৫ মিনিটের অনুষ্ঠান। নাচ, গান, জীবনযাপন প্রণালি।

সামোয়ানদের ঘরগুলো বিশাল গাজিবোর মতো গোল, মাথার ওপরে শুধু চাল, বাকি সব উন্মুক্ত, কোনো দেয়াল বা দরজা-জানালা নেই। সেখানে মুক্ত হাওয়া খেলে সারা ঘরে। সেখানে চন্দ্রালোকে নারী উন্মুক্ত হয় তার প্রেমিক পুরুষের সামনে এবং সমস্ত আকাশ, নক্ষত্রের আলো, রাতজাগা খেচর, জোনাকি পোকা, ও পাদপ-পুত্রিরা দেখে ভালোবাসার মন্থন। কত সহজ জীবন তাদের। দৃষ্টির আড়ালের জীবন দৃষ্টির সামনে।

পলিনেশিয়ান ছয়টি দ্বীপের প্রতিনিধিত্ব আছে এখানে। এবং তাদের প্রীতি অভিবাদনগুলো বেশ সুন্দর।

হাওয়াই দ্বীপে ওরা বলে– 'আলোহা', আর সামোয়া দ্বীপে- 'টালোফা'। তাহিতি দ্বীপের মেয়েরা আগুনের মতো, ওরা ফিক করে হাসে আর কোমর দুলিয়ে বলে– 'লা অরানা'।

ফিজিয়ানরা গম্ভীর, বলে– 'বুলা ভিনাকা'। টোঙ্গার ওরা বলে কবিতার ভাষায়– 'মালোয়ে লেলে'।

আর এওটিয়ারোয়া বা নিউজিল্যান্ডের দ্বীপে বলে– 'কিয়া অরা'।

ভিন্ন ভিন্ন ভাষা, সংস্কৃতি, জীবনযাপন, প্রেম-ভালোবাসা, আশা-আকাঙ্ক্ষা ও দ্রোহের জগৎ। কত নাচ, কত গান, ঢোল ও ড্রামের দ্রুত তাল। নারীরা নিজ নিজ লোকজ স্কার্ট পরে নাচছে। তাদের মাথায় পত্রপল্লবের চক্র, গলায় ফুলেল বর্ণ বৈচিত্র্যের মালা, আর চোখে বনহরিণীর চকিত চাহনি। তাদের উরু ও শ্রোণিতে অসামান্য গতি ও দ্রুতির হুলা-ঝরনা। তাদের বুকে কালবৈশাখীর নর্তন। এত গতি কোত্থেকে? এত যৌবন? এত ঢেউ?

টিপটিপ করে একটু বৃষ্টির পরে রোদ ঝলমল করে। বিশাল এক রামধনু জুড়ে দিয়েছে আকাশের এপাশ-ওপাশ। এমনি এক রামধনু বেয়ে হাওয়াইয়ের 'বোরো বোরো' দ্বীপের মহাপর্বত 'পাহিয়া' থেকে নেমে আসত যুদ্ধদেব 'ওরো' (Oro)। সে 'ভাইট্যাপি' গ্রামের এক মানবীকে ভালোবেসেছিল।

বৈরামতি ছিল তার নাম। 'ওরো' তাকে হ্রদের জলে স্নানরত দেখেছিল। আর যোদ্ধার সাজে তার সুদর্শন রূপ দেখে বৈরামতিও ভালোবেসে নিজেকে সমর্পণ না করে পারেনি। কী হয় এই রূপযৌবন দিয়ে, যদি তার মধু পান না করে ভালোবাসার মধুকর?

এরপর থেকে প্রতিদিন প্রত্যুষে সে নেমে আসত রামধনুর সিঁড়ি বেয়ে, সারাদিন কাটাত বৈরামতির সঙ্গে, তারপর সন্ধ্যায় চলে যেত 'পাহিয়া' পর্বতে। কতটুকু দূর 'ভাইট্যাপি' গ্রামের সেই গ্রাম থেকে, যেখানে কী যেন নাম তার, মিশনপাড়া?

সেখানেও তো প্রতিদিন ছুটে যেত একতাল অনুভূতির এক স্কেলেটন।

বিগত হয়ে যাওয়া ভালোবাসা ও প্রেমের উঠানে এখন উন্নতির বহুতল ইমারত। শুধু আগাছা, ছত্রাক আর শূন্য হাওয়া হুহু করে স্মৃতির গুদামে।

মিশনপাড়ার সেই উঠান ছিল সংকীর্ণ, কিন্তু ভালোবাসা ছিল বিরাট।

টিনের ঘরের দরজা খুলত অপ্রশস্ত রাস্তায়, দরজার পরে সিমেন্টের সরু 'ওটা', তার মাত্র দেড় হাত দূরে পাষাণের দেয়াল। এত সরু যে মুখোমুখি দাঁড়ালে পিঠ ঠেকে যেত দেয়ালে, আর বুকে বুকে।

যেমন বৈরামতির বুকের স্তন ঠেকত ওরোর বুকে আর ওরোর কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসত। হতো অসম্ভবের অবাস্তব শিহরণের বিকার।

দৈব দুর্ঘটনার সেই সব দিন। হাওয়াই দ্বীপের চেয়েও কত দূরে এখন।

'এই, আমার চোখের দিকে তাকাও না।'

ওরো ঠিকই তাকিয়েছিল, কী যেন ছিল সেখানে, কী যেন, ভীষণ জটিল, সে বুঝতে পারেনি। নিষাদের ব্যাধ। সে তার চোখে তাকিয়ে ব্যাবিলনের আকাশের হাজারো কবুতরের একজন হয়ে গিয়েছিল, যারা ধুপ ধুপ করে মরে পড়ছিল আলেক্সান্দারের পায়ের সামনে।

মৃত কবুতর! অর্নিটোজ রোগে নয়, ভালোবাসার রক্তক্ষরণে।

আচার্য বলেছিল, 'ও শহরে যেও না, নির্ঘাত মারা যাবে'। আলেক্সান্দার শোনেনি।

জেদি ও আত্মম্ভরি। শোনেনি বলেই .... সে মৃত, ওরো নয়, আর আমি ... পৃথিবীর পথে।

'ওরো' কি এখনও আসা-যাওয়া করে বৈরামতির কাছে?

রামধনু এখনও ওঠে। এখনও বুকের এক পাশ চিরে অন্য পাশে জোরা লাগিয়ে যায়। ❖